OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 85 - 91
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 85 - 91
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বীরভূম অঞ্চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ও প্রভাব : একটি সমীক্ষা

তন্ময় ব্যানার্জী
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: tanmoyphd2024@gmail.com
0009-0002-0124-654X

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, শ্রীচৈতন্যদেব, বীরভূম, শ্রীপাট, সমাজ, সংস্কৃতি।

Abstract

এদেশে প্রচলিত মূল ধারার ধর্মমতগুলির মধ্যে অন্যতম হল বৈষ্ণব ধর্ম, এই ধর্মের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু। তবে উপাস্য দেবতা অভিন্ন হলেও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মে যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা একই রকমভাবে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মে দেখা যায় না। গুপ্ত যুগের পর থেকে উত্তর ভারতের পাশাপাশি পূর্ব ভারতে বিশেষত বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ শুরু হয় এবং পরবর্তীতে পাল ও সেন যুগে বাংলার বিভিন্ন অংশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যযুগে বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ঈশ্বর ভক্তি বা সাধনার পাশাপাশি তাঁর এবং তাঁর সহচরদের দৃষ্টিভঙ্গি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনকে সমগ্র ভারতে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মগুলি থেকে বিশিষ্ট রূপদান করেছিল। তৎকালীন জাতিভেদ প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ সমাজে শ্রীচৈতন্যদেব জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর ধর্মমতকে এক স্বতন্ত্র রূপ দেন। শ্রীচৈতন্যদেব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব তৎকালীন বীরভূম জেলাতেও দেখা গিয়েছিল। এই জেলার নানাস্থানে শ্রীপাট প্রতিষ্ঠিত হয়। জলুন্দিতে জেলার প্রথম শ্রীপাট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র বীরভূমে অহিংস বৈষ্ণব প্রেমধর্মের প্রচারের সূচনা করেন শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম প্রিয় পার্ষদ এবং দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ধনঞ্জয় পন্ডিত। এছাড়াও পরবর্তীতে মুলুক, কোমা, মঙ্গলডিহি প্রভৃতি গ্রামেও শ্রীপাট প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব শ্রীপাটগুলি থেকে সমাজের সকল স্তরে শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ ও প্রেমভক্তি মূলক ধর্মবাণী প্রচারিত হয়। বীরভূমের প্রচলিত শিল্পগুলির মাধ্যমেও সাধারণ মানুষের কাছে বৈষ্ণব ধর্ম পৌঁছে গিয়েছিল। কীর্তনের মাধ্যমে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রচার ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও প্রচলিত যাত্রা গানের মধ্যেও বৈষ্ণব ধর্মের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পাশাপাশি পটচিত্রের মূল বিষয়গুলির মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম অন্যতম হয়ে ওঠে, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রী চৈতন্যদেবের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী সহজ ভাষায় গান ও কথার মাধ্যমে পটুয়ারা জনপ্রিয় করে তোলেন আবার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 85 - 91
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মন্দির গাত্রের অলংকরণের ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব ধর্ম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এপ্রসঙ্গে জয়দেব কেন্দুলি, চন্ডীদাস নানুরে অবস্থিত মন্দিরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এভাবেই বীরভূমের সমাজ-সংস্কৃতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছিল এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একত্রে আনার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দের অনুসারীগণ।

Discussion

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগের উত্তরতম জেলা বীরভূম, ২৩° ৩২' ৩০" ও ২৪° ৩৫' ০০" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ১' ৪০" ও ৮৭° ৫' ২৫" পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত এই জেলার মোট আয়তন ৪৫৫০.৯৪ বর্গকিলোমিটার।[১] বীরভূম জেলার পূর্বে রয়েছে মুর্শিদাবাদ এবং কিছু অংশ জুড়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা, উত্তর ও পশ্চিমে রয়েছে ঝাড়খন্ড রাজ্য এবং অজয় নদ বীরভূমের দক্ষিণ সীমানা নির্ধারণ করেছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বীরভূমের মোট জনসংখ্যা ৩৫,০২,৩৮৭ জন।[২] এই জেলার জনসংখ্যার ৬২.৩ শতাংশ হিন্দু ধর্মকে অনুসরণ করেন এবং ৩৭.১% মানুষ ইসলাম ধর্মানুসারী এছাড়া অন্যান্য ধর্মের অনুসারীও রয়েছেন ০.৬ শতাংশ মানুষ। প্রাচীনকাল থেকেই বীরভূমে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ এবং জৈন সকল ধর্মই অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত থাকলেও জেলার বিভিন্ন স্থানে শৈবক্ষেত্র এবং শাক্ত পীঠের আধিক্য থাকায় এই জেলায় শৈব এবং শাক্ত এই দুই সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য ছিল। তবে শৈব এবং শাক্ত দেবদেবীর উপাসনা ক্ষেত্র হলেও প্রাচীনকাল থেকেই বীরভূমের বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব ধর্মের উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর বিভিন্ন প্রকার মূর্তি খুঁজে পাওয়া গেছে যা এই জেলায় বৈষ্ণবদের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। গুপ্ত পরবর্তী সময় থেকে উত্তর ভারতের পাশাপাশি বাংলাতেও বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ ঘটলেও বীরভূমে এই ধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় প্রধানত মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য পরবর্তী সময়। শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুগামীদের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচারিত হওয়ার ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বীরভূমেও এই ধর্ম দর্শন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রচারক ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠ শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্ম হয়েছিল বীরভূমের বীরচন্দ্রপুর এর নিকটবর্তী ছোট গ্রাম গর্ভবাসে।[৩] তাঁর পিতার নাম ছিল হারাই পন্ডিত এবং মাতা পদ্মাবতী দেবী।[৪] তবে বীরভূমে জন্মগ্রহণ করলেও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কর্মক্ষেত্র বীরভূম ছিল না। যখন তাঁর মাত্র ১২ বছর বয়স সেই সময় এক সন্ন্যাসী তাঁর পিতার কাছে এসে তীর্থসঙ্গী হিসেবে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন এবং তাঁর পিতা সন্ন্যাসীর এই প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যানে অসফল হওয়ার ফলে সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গৃহত্যাগী হন।[৫] এরপর তিনি সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ঘুরে অবশেষে বাংলায় ফিরে নবদ্বীপে গিয়ে নন্দন আচার্য নামে এক ব্যক্তির আতিথেয়তা গ্রহণ করেন এবং সেখানেই শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।[৬] এরপর শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেও জন্মস্থান বীরভূমে প্রেমভক্তি মূলক বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনের প্রচারে আসেননি। তিনি বীরভূমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তাঁর পরম ভক্ত এবং দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীমৎ ধনঞ্জয় পন্ডিতের উপর।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সখাগন 'গোপাল' নামে পরিচিত ছিলেন, এই সখাগণ আবার ১. সুহৃৎ, ২. সখা, ৩. প্রিয়সখা এবং ৪. নর্ম্মসখা - এই চার ভাগে বিভক্ত এবং এঁদের মধ্যে 'প্রিয়সখা' এবং 'নর্ম্মসখা' দের মধ্যে থেকে দ্বাদশ গোপাল শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[৭] 'শ্রীচৈতন্যভগবতাদি' গ্রন্থ অনুসারে দ্বাদশ গোপালের মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীধর পন্ডিত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ এবং বাকি ১১ জন গোপাল ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পার্ষদ এবং এঁরা প্রত্যেকে ছিলেন মহাপন্ডিত এবং সুদর্শন।[৮] শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শাখার ১১ জন গোপালের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীধনঞ্জয় পন্ডিত। 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা' গ্রন্থে দ্বাদশ গোপালের পরিচয়পর্বে বর্ণিত হয়েছে—

"বসুদামসখা যশ্চ পন্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ।"

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 85 - 91
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অর্থাৎ, ব্রজধামের শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখাদের অন্যতম বসুদাম গৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীধনঞ্জয় পন্ডিত রূপে আবির্ভূত হন।[৯] ১৪০৬ শকের চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে চট্টগ্রামের জাড় গ্রামে শ্রী ধনঞ্জয় পন্ডিত আবির্ভূত হন, তাঁর পিতা ছিলেন শ্রীপতি বন্দোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতি কালিন্দী দেবী। তিনি যথেষ্ট ধনী পরিবারের জন্মগ্রহণ করলেও বিবাহ পরবর্তী সময়ে তীর্থভ্রমন বলে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তীর্থ ভ্রমণের পূর্বে তাঁর পিতা তাকে পথ খরচের জন্য বহু অর্থ প্রদান করেছিলেন, যা তিনি শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শ্রীপাঠ যাজিগ্রামে মহাপ্রভুর হাতে তুলে দিয়ে ভিক্ষার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করে ভক্তি ধর্ম এবং হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ধনঞ্জয় পন্ডিতের জীবনের এই পর্ব বর্ণনায় একটি শ্লোক বিশেষভাবে খ্যাত -

"বিলাস-বৈরাগ্য বন্দ পন্ডিত ধনঞ্জয়।
সকল প্রভুকে দিয়া ভান্ড হাতে লয়।।"[১০]

পরবর্তীতে ধনঞ্জয় পন্ডিত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বাণী প্রচার করেছেন এবং বহু মানুষকে হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করেছেন। এ সময় তিনি শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন বর্ধমান জেলার শীতলগ্রামে এবং সেখানকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও পাষন্ড মানুষদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের প্রেমের বাণী প্রদান করেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার ঘটিয়ে শ্রীপাট শীতল গ্রামকে অন্যতম বৈষ্ণব ক্ষেত্রে পরিণত করেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত থেকে জানা যায় এ সময় তিনি কিছুদিনের জন্য নবদ্বীপে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে নাম সংকীর্তন করে পুনরায় শীতলগ্রামে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বৃন্দাবন থেকে ফেরার সময় তিনি বীরভূমের জলুন্দি (জলন্দি) গ্রামে বসবাস করে দেবতার উপাসনা করেন এবং প্রতিষ্ঠিত হয় বীরভূম জেলার প্রথম পাটবাড়ী শ্রীপাঠ জলুন্দি। শ্রীপাট জলুন্দি থেকেই শুরু হয় বীরভূম জেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অহিংসা ও প্রেমের বাণী প্রচার। জলুন্দিতে কিছুদিন কাটিয়ে তিনি পুনরায় ফিরে যান শীতলগ্রামে এবং শ্রীপাট জলুন্দির দায়িত্ব গ্রহণ করেন ধনঞ্জয় পন্ডিতের ভ্রাতা তথা শিষ্য সঞ্জয় পণ্ডিত। জলুন্দির শ্রীপাটকে কেন্দ্র করে বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে একাধিক শ্রীপাটের। সঞ্জয় ঠাকুরের পুত্র ছিলেন শ্রীশ্রী রামকানাই ঠাকুর যিনি বীরভূম জেলার বোলপুরের নিকটবর্তী গ্রাম মুলুকে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীপাট মুলুকের যা 'শ্রীরামকানাই পাটবাড়ী' নামে পরিচিত।[১১] এই পাটবাড়ীতে পূজিত হন শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রী রাধাবল্লভ-রাধারানী, শ্রী গোপাল এবং রঘুনাথ শ্রীধর নৃসিংহ। শ্রীরামকানাই ঠাকুরের এই মুলুক শ্রীপাট বীরভূমের বৈষ্ণব ধর্মের এক অন্যতম ক্ষেত্র। মুলুক পাটবাড়ী ছাড়াও ধনঞ্জয় পন্ডিতের উত্তরপুরুষেরা জেলা সদর সিউড়ির নিকটবর্তী কোমা গ্রামে আরও একটি শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন এই পাটবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ রামকানাই-রাধারানী। বীরভূম জেলার আরও একটি সুবিখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ক্ষেত্র হল শ্রীপর্ণিগোপাল ঠাকুরের শ্রীপাট মঙ্গলডিহী যা জেলা সদর সিউড়ি থেকে ১০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। শ্রীপর্ণিগোপাল ঠাকুর পান বিক্রি করে কুলদেবতার সেবা করতেন বলে জনসমাজে 'পেনো' বা 'পানুয়া ঠাকুর' নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীপর্ণিগোপাল ঠাকুর মঙ্গলডিহী গ্রামে শ্রী সুন্দরানন্দ ঠাকুর কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন।[১২] পর্ণিগোপাল ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্যামচাঁদ বিগ্রহ এবং শ্রীপাঠ মঙ্গলডিহী এই অঞ্চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের পাশাপাশি সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিকাশের দিকেও অবদান রাখে। পর্ণিগোপাল ঠাকুরের নিজস্ব সন্তান না থাকায় তিনি পোষ্য-পুত্র হিসেবে গড়গড়ে গ্রামের এক ব্রাহ্মণের পাঁচ পুত্রকে গ্রহন করেন এবং তাদের দীক্ষা দেন, এরা ছিল অনন্ত, কিশোর, হরিচরণ, লক্ষণ ও কানুরাম।[১৩] পূর্ণিগোপাল ঠাকুরের মৃত্যুর পর এই পাঁচ পুত্রই বিগ্রহের সেবার এবং সম্পত্তির অধিকার লাভকরেন। এদের মধ্যে অনন্তের বংশধর মঙ্গলডিহী থেকে খয়রাশোলে চলে যান শ্রী বলরাম বিগ্রহ নিয়ে এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন, কিশোরের কোন পুত্র সন্তান ছিল না এবং হরিচরণ ছিলেন অপুত্রক তাই শ্যামচাঁদের সেবার অধিকার লাভ করেন লক্ষণ এবং কানুরামের বংশধররা। পরবর্তীতে গোপালচরণ নামক কানুরামের পুত্রের দুই পুত্র গোকুলানন্দ এবং নয়নানন্দ মঙ্গলডিহী গ্রামকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। গোকুলানন্দ ছিলেন কীর্তনের পদ রচনায় পারদর্শী এবং সুগায়ক। তাঁর এই পারদর্শিতার জন্য তিনি গোস্বামীডিহি এবং মোতাবেগ নামক দুটি নিষ্কর গ্রাম কাশিপুরাধিপতির কাছে লাভ করেন যা থেকে প্রাপ্ত অর্থ শ্যামচাঁদের সেবায় ব্যবহৃত হত।[১৪] গোকুলানন্দের ভ্রাতা নয়নানন্দ ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত। তিনি 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি রসকদম্ব' ও 'প্রোয়োভক্তিরসার্ণব' - এই দুই গ্রন্থের পাশাপাশি বহু কীর্তন পদ রচনা করেন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 85 - 91
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এছাড়াও তিনি মঙ্গলডিহী গ্রামে একটি চতুষ্পাটি প্রতিষ্ঠা করে বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করতেন।[১৫] এইভাবে শ্রীপর্ণিগোপাল ঠাকুর কর্তৃক মঙ্গলডিহী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত পাটবাড়ী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি তৎকালীন বীরভূম জেলার সংস্কৃতিক বিকাশ এবং শিক্ষাদানেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

বীরভূম জেলার লোকশিল্পের উপরেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল যার ফলে এই জেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনের বিস্তারের ক্ষেত্রে পাটবাড়ী গুলির পাশাপাশি কীর্তন, যাত্রাগান, বাউল প্রভৃতির মতো লোকশিল্পগুলিও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। শ্রী চৈতন্য পরবর্তী সময়ে বীরভূমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রাম-গঞ্জ ও শহর-নগরে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে নগর কীর্তন গায়কদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বীরভূমে কীর্তনকে দ্রুত জনপ্রিয় করে তোলেন শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু এবং তাঁর পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র ঠাকুর। অম্বিকা নিবাসী সূর্যদাস সুরখেল নামক এক ব্যক্তি তাঁর দুই কন্যা জাহ্নবী এবং বসুধাকে নিত্যানন্দের হাতে সমর্পণ করেছিলেন এবং নিত্যানন্দের দেহত্যাগের পর জাহ্নবী দেবী তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব দেন। জাহ্নবী দেবী বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে খেতরীর বৈষ্ণব সম্মেলনে নেতৃত্ব দেন, যেখানে লীলাকীর্তনের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হয় এবং সুরের প্রণালী ও বৈচিত্র অনুসারে কীর্তনগানের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। খেতরীর এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে বীরভূমের কীর্তন মনোহরশাহী ঘরানার অন্তর্গত।[১৬] বোলপুরের নিকটবর্তী বরা গ্রামের রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের একজন বিখ্যাত গায়ক তাঁর পিতাও রামায়ন, চৈতন্যমঙ্গল এবং কীর্তন গানের চর্চা করতেন তবে রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কীর্তনগানের একজন বিশিষ্ট শিল্পী। তিনি অতি অল্পবয়সেই তাঁর গানের জন্য নবদ্বীপের বৈষ্ণব পন্ডিত সমাজে পরিচিতি এবং প্রশংসা লাভ করেন, বাংলার বিভিন্ন অংশে বহু বৈষ্ণব পন্ডিত এবং বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী নর-নারীগণ তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হন। আবার অন্যদিকে বীরভূম জেলায় শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের গান গেয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলার পিছনে কীর্ণাহারের নিকটবর্তী মধুডাঙ্গা গ্রামের কীর্তন গায়ক অবধৌত দাস ছিলেন অন্যতম। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার কীর্তনীয়া' শীর্ষক নিবন্ধে অবধৌত দাস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, -

> "ময়নাডালে শ্রী মহাপ্রভুর সম্মুখে মহাপ্রভুর বিবাহোৎসব গানের সময় শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়েছিল, শ্রী বিগ্রোহের উত্তরীয় সিক্ত হইয়াছিল। শ্রীধাম-নবদ্বীপ, কাটোয়া, শ্রীখন্ড, কান্দরা প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থের সর্বত্রই তিনি সমাদ্রিত হইয়াছেন ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছেন।"[১৭]

এ সময় ময়নাডালে একটি কীর্তনের চতুষ্পাঠী ছিল যেখানে বহু কীর্তন গায়ক এবং মৃদঙ্গ বাদক শিক্ষা লাভ করেন এবং একটা সময় ছিল যখন ময়নাডালের এই চতুষ্পাঠীতে না এলে মৃদঙ্গ বাদক এবং কীর্তন শিল্পীদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হত না। বীরভূমের বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে ময়নাডালের এই চতুষ্পাঠীও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কীর্তন শিল্পীরা বাংলার বিভিন্ন স্থানে তাদের কীর্তন গানের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যের বাণী এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনের প্রচার করতেন। ইলামবাজারের নিকটবর্তী পায়ের পাটবাড়ী ছিল বীরভূমের অন্যতম সংস্কৃতিক কেন্দ্র। শ্রীপাট পায়েরকে কেন্দ্র করে ওই অঞ্চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের ক্ষেত্রে কীর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কীর্তন গানে সুনাম অর্জনকারী নিমাই চক্রবর্তী ছিলেন পায়েরের বড় বাড়ির পরমানন্দ গোস্বামী দৌহিত্র।[১৮] বীরভূমের এইসব কীর্তন শিল্পীদের কীর্তনে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং জেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। কীর্তনের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এক সুতোয় বাঁধার প্রবল চেষ্টা চালিয়েছিলেন কীর্তন শিল্পীগণ যার ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর জাতিভেদে আবদ্ধ সমাজের নিম্নস্তরের মানুষেরা ক্রমশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেন। কীর্তনের পাশাপাশি এই অঞ্চলের যাত্রাগানও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন যাত্রাপালার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমমূলক বাণী প্রচারিত হতে থাকে। বীরভূমে যাত্রাপালার ক্ষেত্রে কৃষ্ণযাত্রা ছিল সর্বোচ্চ জনপ্রিয় এবং বীরভূমে কৃষ্ণযাত্রার অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় যিনি 'কণ্ঠ মহাশয়' নামে সুপরিচিত ছিলেন।[১৯] শ্রীকৃষ্ণ এবং চৈতন্যের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী যাত্রাগানের এসব বিখ্যাত শিল্পীরা তাদের অভিনয় এবং গানের মাধ্যমে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 85 - 91
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মানুষের কাছে তুলে ধরতেন যার ফলে সমাজের সকল স্তরের মানুষ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারতেন।

শ্রীচৈতন্য পরবর্তী সময়ে বীরভূমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশের প্রভাব দেখা গিয়েছিল তৎকালীন মন্দির স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের উপরেও। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা মন্দিরগুলির ভাস্কর্যে স্থান পেয়েছিল বিষ্ণু এবং তাঁর বিভিন্ন অবতারের চিত্র। একটি বিশেষ জিনিস এ সময় লক্ষ্য করা গিয়েছিল যা হল বিভিন্ন শাক্ত বা শৈব মন্দিরের ভাস্কর্যে যেমন বৈষ্ণব কেন্দ্রিক বিভিন্ন দৃশ্য স্থান করে নিয়েছিল তেমনি আবার বেশ কিছু বৈষ্ণব মন্দিরের গাত্রে শৈব এবং শাক্ত দেব-দেবীর বিভিন্ন দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছিল যা শ্রীচৈতন্য পরবর্তী যুগে বীরভূম তথা বাংলায় ধর্ম সমন্বয়ের দিকটি তুলে ধরে।[২০] বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন টেরাকোটা মন্দিরে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ লীলার বিভিন্ন দৃশ্য, শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী স্থান করে নিয়েছে। বীরভূমের নানুর থানার অন্তর্গত চন্ডীদাস নানুরে ঢিবির উপর বিশালাক্ষী বা বাসুলি মন্দিরসহ ১৪টি শিব মন্দির রয়েছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে দুটি উত্তরদুয়ারী আটচালা মন্দিরের গাত্রে বিভিন্ন অলঙ্করণ দেখা যায় যার মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণলীলা এবং দশাবতার।[২১] বীরভূম জেলার পূর্ব সীমান্ত অবস্থিত নানুর থানার অন্তর্গত অন্য একটি গ্রাম হল দাসকলগ্রাম, এই গ্রামে দুইটি শিব মন্দির রয়েছে, পূর্ব দুয়ারী এবং আট-চালা বিশিষ্ট এই মন্দিরগুলির গাত্রের ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে রামায়ণের বিভিন্ন দৃশ্যাবলী, দশাবতার এবং গরুড়বাহনোপরি বিষ্ণু প্রভৃতি দৃশ্য।[২২] তবে জেলার সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও প্রাচীনতম আট-চালা মন্দিরটি অবস্থিত সদর শহর সিউড়ির দক্ষিণাংশে সোনাতোড়পাড়ায়, এই মন্দিরটি রাধা-দামোদর মন্দির নামে পরিচিত এর নির্মাণকাল না জানা গেলেও মন্দির শৈলী দেখে অনুমান করা হয় এর নির্মাণকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।[২৩] এই মন্দিরের সামনের খিলানের উপর বিভিন্ন পৌরাণিক দৃশ্য অলংকৃত রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কালীয়দমন, নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণ, সংকীর্তনের দৃশ্য, অনন্তশায়ী বিষ্ণু প্রভৃতি। মন্দির স্থাপত্যের দিক দিয়ে মহম্মদ বাজার থানার অন্তর্গত গণপুর উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামের মত এত সংখ্যায় উন্নত মানের অলংকৃত মন্দির বীরভূম জেলায় কোন গ্রামে একসঙ্গে দেখা যায় না। গ্রামের মধ্যে ১৪টি শিব মন্দির রয়েছে চার-চালা রীতির এবং একটি দোলমঞ্চ অবস্থিত। এই মন্দিরগুলির মধ্যে চারটিতে উৎকীর্ণ সন-তারিখ থেকে মন্দিরগুলি যে ওই গ্রামের চৌধুরী পরিবার কর্তৃক ১৭৬৭ থেকে ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছে তা জানা যায়।[২৪] এই মন্দিরে খিলানের উপর এবং দ্বারের পাশে পাথরের সজ্জিত ফলকগুলি রয়েছে যেগুলিতে রাম-রাবণের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ অনন্তশায়ী বিষ্ণু, রাসমন্ডল, কৃষ্ণলীলা সহ দশাবতার প্রভৃতি বৈষ্ণব কেন্দ্রিক দৃশ্যাবলী। এই মন্দিরগুলি থেকে অনতিদূরে অবস্থিত ৫টি চার-চালা রীতির মন্দির রয়েছে যেগুলির খিলান এর উপর উৎকীর্ণ হয়েছে কৃষ্ণের জন্ম, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের দৃশ্য যেখানে দুঃসাশন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং দ্রৌপদীকে রক্ষা করছেন শ্রীকৃষ্ণ। এছাড়াও সমুদ্র মন্থনের দৃশ্য রয়েছে এই মন্দিরের খিলানে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব দেখা যায় বীরভূম জেলার দক্ষিণ প্রান্তে অজয় নদীর তীরে অবস্থিত জয়দেব-কেন্দুলী গ্রামের শ্রীরাধাবিনোদ মন্দিরেও। গঠন রীতির দিক দিয়ে এই মন্দিরটি একটি নবরত্ন মন্দির এবং এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীরাধাবিনোদ নামে পরিচিত। এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন বর্ধমানের মহারানী নৈরাণী দেবী সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৯২ খ্রিস্টাব্দে)।[২৫] এই মন্দিরে সামনের দিকে মৃৎফলকের উপর বিভিন্ন পৌরাণিক ঘটনা অলংকৃত হয়েছে এর মধ্যে অধিকাংশই রামায়ণের দৃশ্যাবলী এর পাশাপাশি রয়েছে কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী, দশাবতারগণের প্রতিকৃতি। এছাড়াও বীরভূমের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই সময় যে মন্দিরের অলংকারনে বৈষ্ণব ধর্ম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা এইসব মন্দিরের গাত্রে অলংকৃত মৃৎফলক এবং প্রস্তরফলকগুলি থেকে অনুমান করা যায়। মন্দির স্থাপত্য-ভাস্কর্যের পাশাপাশি চিত্রকলা বিশেষত বীরভূমের পটুয়াদের অঙ্কিত পটচিত্রের উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পটচিত্রের মূল বিষয়বস্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় ধর্মীয় কিংবা সামাজিক। বীরভূমের পটচিত্রে শৈব এবং শাক্ত দেবদেবীগণ অধিক গুরুত্ব পেলেও শ্রী চৈতন্য পরবর্তী যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তারের সময় এই অঞ্চলের পটুয়াদের পছন্দের বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 85 - 91
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ ও গৃহত্যাগ থেকে শুরু করে নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর মিলন, নগরকীর্তনের বিভিন্ন দৃশ্যাবলী, জগাই-মাধাই উদ্ধার সবকিছুই পটচিত্রের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সামাজিক মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে নগরকীর্তনের পাশাপাশি পটচিত্রও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

সমগ্র বাংলার মতোই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বীরভূম জেলাও ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুসংস্কার এবং জাতিভেদ প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ। পঞ্চদশ শতকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে তাঁর এবং তাঁর অনুগামীদের মাধ্যমে বাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিকাশকালে বীরভূম জেলাতেও এই ধর্ম দর্শন প্রবেশ করে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিচুস্তরে বসবাসকারী থেকে শুরু করে সমাজের লাঞ্ছিত এবং পীড়িত মানুষজনকে মর্যাদা প্রদান করে জেলায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীপাট এবং সেগুলির প্রতিষ্ঠাতা গণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পালিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে সমমর্যাদা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে মূলকের রামকানাই ঠাকুরের পাটবাড়ীতে আয়োজিত গোষ্ঠাষ্টমী সমাবেশ, ভান্ডীরবনের শ্রীগোপালজীউ এর বনভোজন, পানুরিয়ার বিশ্রামতলায় নিত্যানন্দ তিথির অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেখানে সমাজের সকল স্তরের মানুষজন জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে একত্রে বসে কখনও হরিনাম সংকীর্তন শুনতেন আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণ করতেন। অন্যদিকে শৈব এবং শাক্ত ধর্মের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল এই সময় তা আমরা বিভিন্ন শৈব এবং শাক্ত দেবদেবীর মন্দিরে অলংকৃত বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর প্রতিকৃতি থেকে অনুমান করতে পারি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকের পাশাপাশি রাজনৈতিক দিকেও নজর দিলে দেখা যাবে এই অঞ্চল কিছুটা স্রোতের বিপরীতে প্রবাহিত হয়েছিল। সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের সময় থেকেই বিভিন্ন হিন্দু মন্দির এবং তীর্থস্থান গুলির ওপর আক্রমণের নিদর্শন পাওয়া গেছে এবং ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরেও এই ধরনের বহু আক্রমণের কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত তবে শ্রী চৈতন্য পরবর্তী সময়ে বীরভূম অঞ্চলে কিছুটা অন্য ছবি দেখা গিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাসভূমি হলেও এখানকার প্রজাদের সিংহভাগই ছিল হিন্দু কিন্তু এখানকার পাঠান শাসকদের ধর্ম ছিল ইসলাম, যার ফলে মন্দির নির্মাণ, ধর্মপালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাধা আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব দেখা গিয়েছিল তৎকালীন বীরভূমের রাজনগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পাঠান শাসকদের উপরেও। এই সময় বীরভূমের রাজনীতি ও ধর্মীয় জীবনের উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব এতটাই ছিল যে এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির জন্য প্রয়োজনীয় জমি মন্দির নির্মাতারা অনেক ক্ষেত্রেই পাঠান রাজ পরিবারের সদস্যদের থেকে লাভ করেছিলেন, এক্ষেত্রে ভান্ডীরবনে প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্রী গোপালজিউ মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্রগুলিতে আয়োজিত রাসযাত্রা উপলক্ষে মেলা, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও কোন প্রকার জাত বিচার করা হত না সমাজের সকল স্তরের মানুষ সমানভাবে এইসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। সুতরাং শ্রী চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিমূলক আদর্শ নিয়ে প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের ফলে সমগ্র বাংলায় যে নবজাগরণ ঘটেছিল তা বীরভূমের সমাজ-সংস্কৃতির উপরও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল যা এই অঞ্চলের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল এবং সমাজের চলমানতা বৃদ্ধি করেছিল।

Reference:

১. Majumdar, Durgadas, West Bengal District Gazetteers Birbhum, Govt. of West Bengal, Calcutta, 1975, p. 2

২. Directorate of Census Operations, West Bengal, District Census Handbook : Birbhum – Village and Town Directory, Census of India 2011, Series-20, Part XII-A, Office of the Registrar General & Census Commissioner of India, New Delhi, 2011, p. 43

৩. O' Malley, L. S. S., Bengal District Gazetteers: Birbhum, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1910, p. 111

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 12
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 85 - 91
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৪. চক্রবর্তী, মহিমানিরঞ্জন (সম্পাদনা), বীরভূম-বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ড, বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি, হেতমপুর, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫৫
৫. তদেব, পৃ. ১৫৮
৬. তদেব, পৃ. ১৬৩
৭. রায় ভট্ট, অমূল্যধন, শ্রী শ্রী দ্বাদশ গোপাল বা শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত, মানসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১
৮. তদেব, পৃ. ১৫
৯. তদেব, পৃ. ৩
১০. তদেব, পৃ. ৫৪
১১. তদেব, পৃ. ৫৬
১২. চক্রবর্তী, মহিমানিরঞ্জন (সম্পাদনা), বীরভূম-বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ড, বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি, হেতমপুর, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭৬
১৩. তদেব, পৃ. ১৭৬
১৪. তদেব, পৃ. ১৭৭
১৫. তদেব, পৃ. ১৭৭
১৬. দাস, প্রভাতকুমার, বীরভূমের কীর্তন ও যাত্রাপালা, পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ-পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৩১২
১৭. তদেব, পৃ. ৩১৩
১৮. তদেব, পৃ. ৩১৪
১৯. তদেব, পৃ. ৩১৬
২০. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম একটি ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৭৩
২১. চক্রবর্তী, দেবকুমার, বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি, পূর্ত বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৩৫
২২. তদেব, পৃ. ৪৪
২৩. তদেব, পৃ. ৮৫-৮৬
২৪. তদেব, পৃ. ২৯-৩১
২৫. তদেব, পৃ. ৩৭-৩৯